চেঙ্গা-বেঙ্গার অ্যাডভেঞ্চার

বিমল ঘোষ



চেঙা-বেঙার অ্যাডভেঞ্চার

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

চেঙ্গা-বেঙ্গার অ্যাডভেঞ্চার

ছবি: দেবাশিস দেব



শিশু সাহিত্য সংসদ

CHENGA-BENGAR ADVENTURE
(Adventures of Chenga, the Rabbit and Benga, the Frog)
by Bimal Ghosh

ISBN : 978-81-7955-272-8

প্রচ্ছদ : দেবাশিস দেব

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৮
নতুন সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.,
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক : ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রা. লি., ১৮৫/১, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২

চেঙা-বেঙার
কী কী
অ্যাডভেঞ্চার









ভূমিকা

চিত্রময় 'চেঙা-বেঙা' এবার হল বর্ণময়—বহুবর্ণের এক নতুন সংস্করণ। নামটাও নতুন—'চেঙা-বেঙার অ্যাডভেঞ্চার' আর তিনটে বই জুড়ে একটা। আগে ছিল তিনটে বই আলাদা আলাদা—প্রথম বইয়ের নাম 'পিকনিক', দ্বিতীয় 'নাকাল নেংটি' এবং তৃতীয় 'চালাক বোকা'। আজও গল্পের নাম তাই আছে। শুধু এরা এখন দুই মলাটের মধ্যে একত্রে একটি বই।

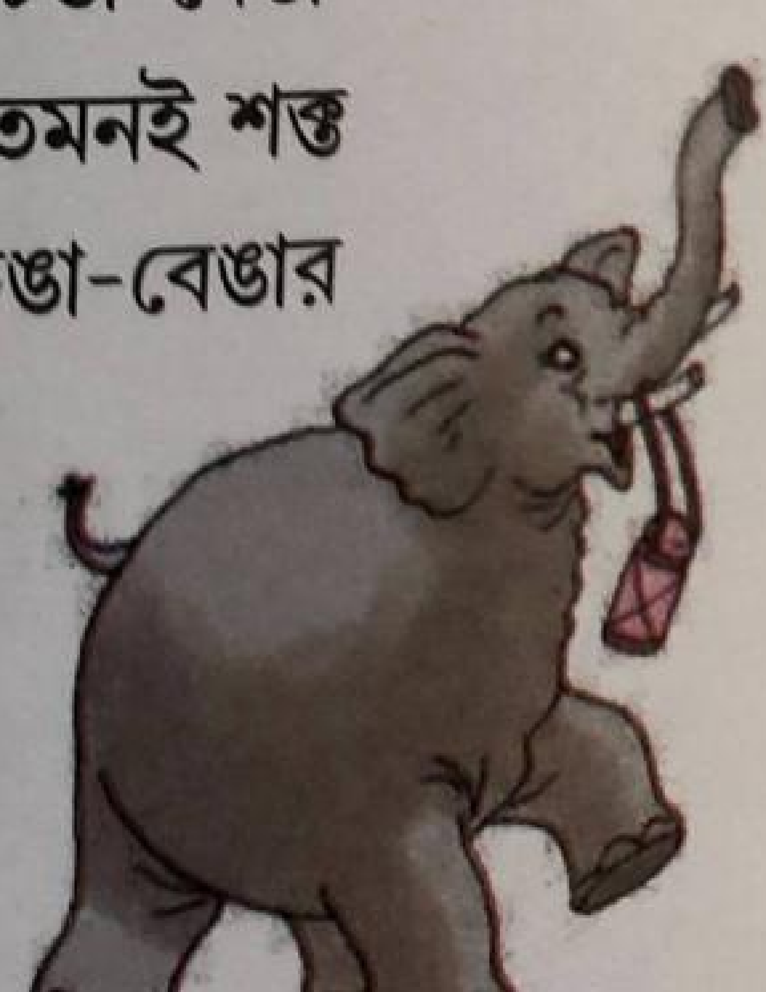




সেই কবে এদের প্রথম প্রকাশ—ষাট বছর আগে। প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৯৫৬ সালে। বাকি দু-টি ১৯৫৭-র প্রথম দিকে। দুই বর্ণের ছিল তখন। ছবির শিল্পী ছিলেন ধীরেন বল। পরে সে ছবির শিল্পী বদল হয়েছে। এবারের সংস্করণে আবার নতুন শিল্পী। ছবি নির্ভর বইয়ের যা ধরন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছবি বদলে পুরোনো গল্পের স্বাদ অপরিবর্তিত রাখতে হয়। নতুন সংস্করণে সেটুকুই করা হয়েছে।

আশা করছি ষাট বছর ধরে যে আকর্ষণে 'চেঙা-বেঙা' বেঁধে রেখেছে শিশুদের মন, আজও সে বাঁধন তেমনই শক্ত আছে। একবার ধরলে শেষ না করে 'চেঙা-বেঙার অ্যাডভেঞ্চার'-এর হাত থেকে রেহাই নেই।

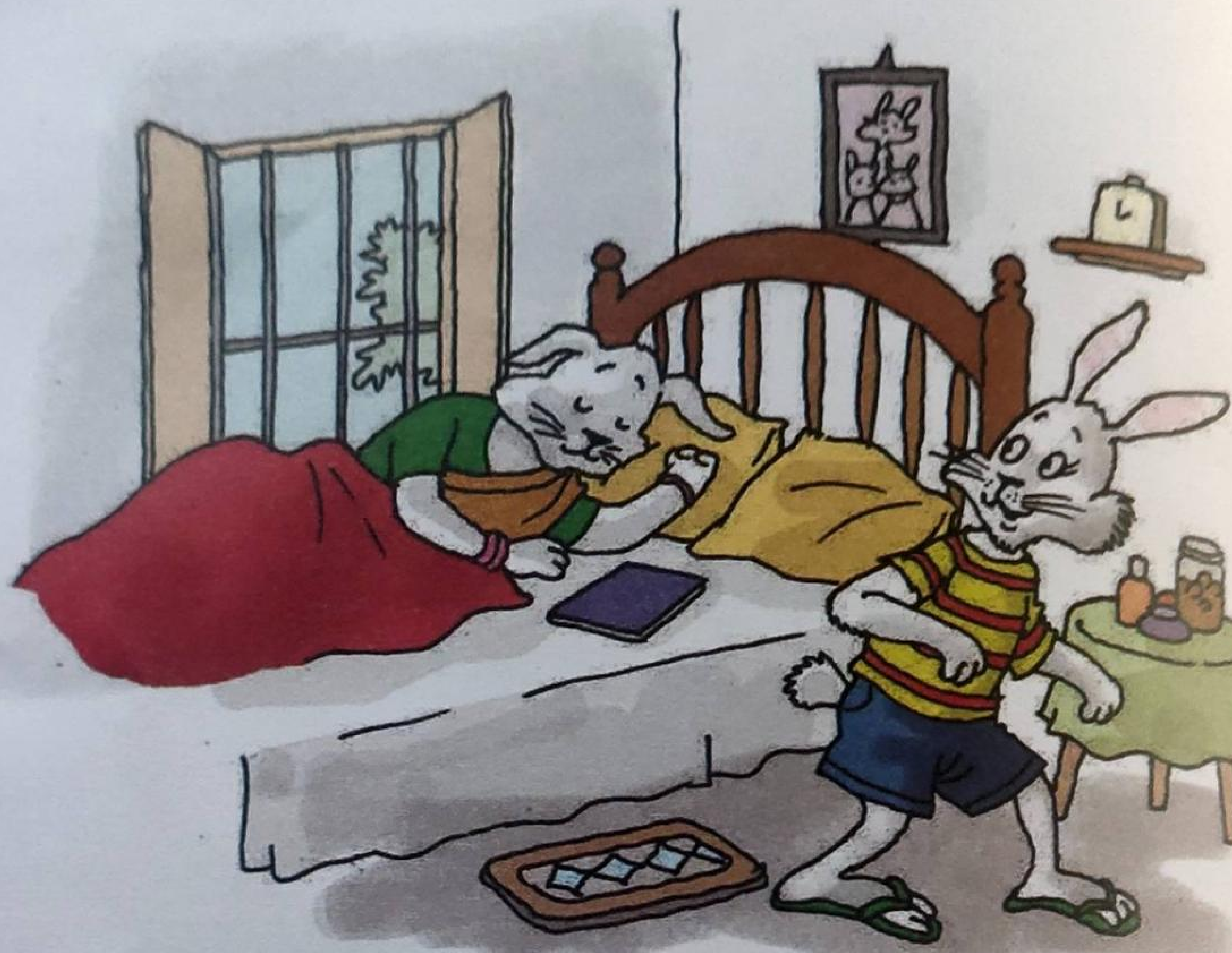






পিকনিক





বনপাড়ার বুড়ো বট গাছ। তারই কোটরে চেঙাদের বাসা। সেখানে থাকে চেঙা খরগোশ, আর চেঙার মা।

চেঙা ভারি ছটফটে। কেবল খেলা, কেবল ছুটোছুটি। দুপুর রোদেও চেঙা ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াতে চায়। তাই তার মা ওকে রোজ দুপুরেই পাশে নিয়ে শোয়। মায়ের পাশে শুয়ে চেঙা মটকা মেরে পড়ে থাকে। ঘুমের ভান করে। আর যেই মা ঘুমিয়ে পড়ে—অমনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে বাড়ির বাইরে।

একদিন অমনি মা ঘুমোতেই চেঙা বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।



দুপুর বেলা, খাঁ-খাঁ করছে রোদ। চেঙা চলল বেঙার খোঁজে। মাঠ পেরিয়ে, হাট ছাড়িয়ে অনেক দূরে বেঙাদের বাড়ি। বেঙারা খুব বড়োলোক। ওর বাবা-মা মারা গেছে। রেখে গেছে অনেক টাকাকড়ি, বড়ো বড়ো বাড়ি আর একখানা মোটর গাড়ি।

তাই বেঙা খেয়ে-দেয়ে, নেচে-গেয়ে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। লেখাপড়া কাজ-কারবারের বালাই তার নেই।

চেঙা চলেছিল এই বেঙা মিতার কাছে। তেঁতুলতলার বাঁকটাতে মোড় ঘুরতেই চেঙা দেখে বেঙা চলেছে ছাতা মাথায় দিয়ে। চেঙা বলল—"কোথায় চলেছ বেঙাদাদা?"

বেঙা বলল—"হাটে যাব ডিম, পাঁউরুটি কিনতে।"



ডিম, পাঁউরুটির নাম শুনে চেঙার জিভ দিয়ে জল গড়ায়। হ্যাংলা চেঙা ল্যাং ল্যাং করতে করতে চলল বেঙার পিছু পিছু। হাটের একপাশে হাঁদি হাঁসি আর খাঁদি মুরগির ডিমের দোকান। রোজ ওরা এত এত ডিম পাড়ে। সেগুলো বেচে পয়সা রোজগার করে। বেঙা ওদের দোকানে গিয়ে এককুড়ি ডিম কিনল।

ম্যাঁও ম্যাঁও বেড়ালের দোকান থেকে চারখানা পাঁউরুটি, পায়রা ময়রার দোকান থেকে চমচম, ল্যাংচা আরও কত কী কিনল ওরা।

বেঙার ছাতার ওপরে গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল নেংটি। সেখান থেকে সে সব দেখল, সব শুনল। তবে চেঙা-বেঙা টের পেল না সেটা।



ডিম, পাঁউরুটি, চমচম এইসব কিনে—বাড়ি ফিরল চেঙা-বেঙা। বেতের বাক্সতে ডিম, পাঁউরুটি, ল্যাংচা, মেঠাই, চমচম, জিবেগজা গুছিয়ে নেওয়া হল।

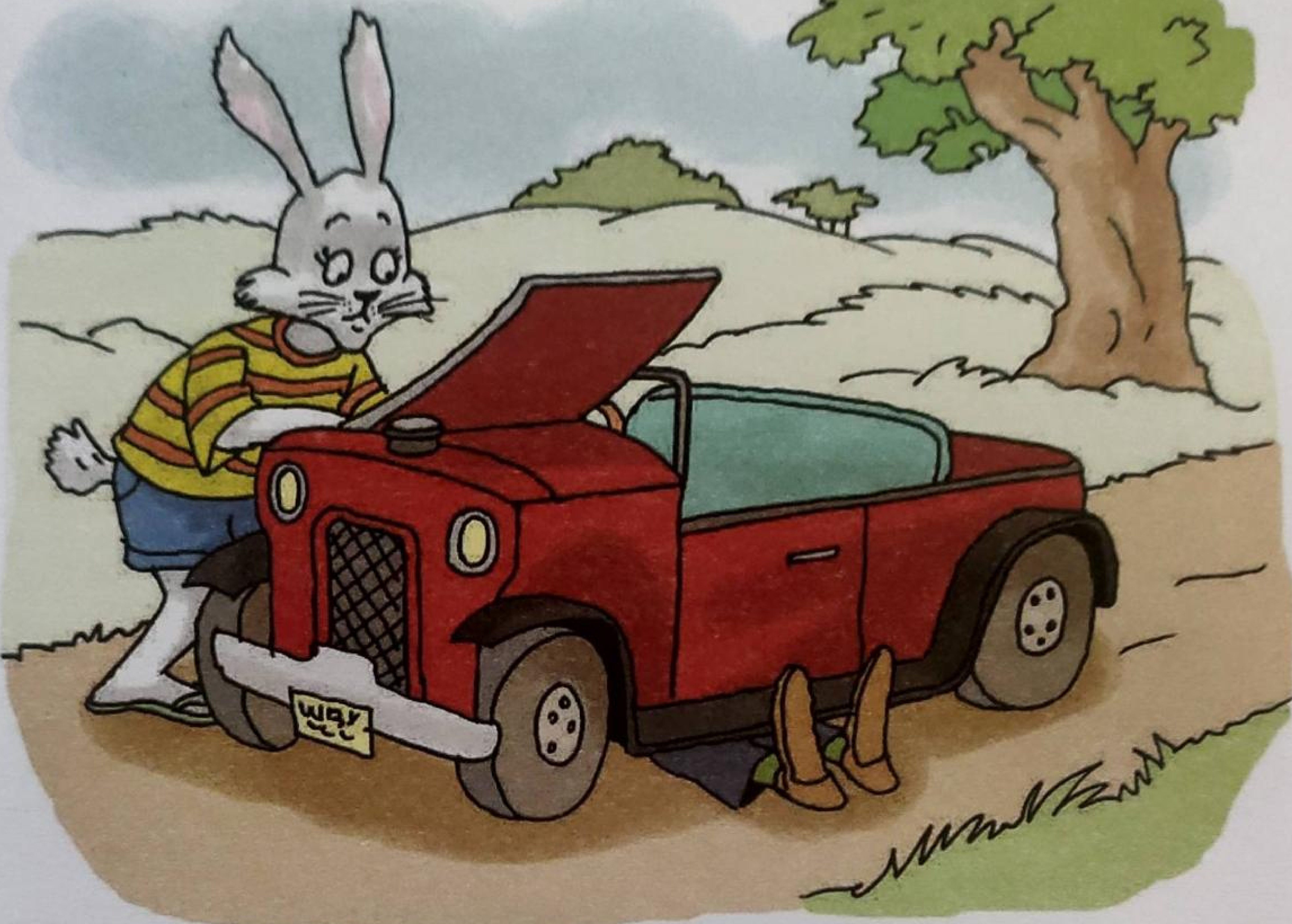
চেঙা তখন বুঝল—পিকনিক করতে যাবে বেঙা! তাই এত কেনাকাটা! ন্যাংলা নেংটি টেবিলের ওপর থেকে সবই দেখল! তবু ওকে চেঙা-বেঙা কেউই দেখল না। কেউই ডাকল না! মনে মনে তাই ন্যাংলা নেংটি বেজায় রেগে গেল। রাগবার কথাই তো! ছোটো বলে ন্যাংলা নেংটি অত হেলাফেলা সইবে কেন?



চেঙা-বেঙা পিকনিকের খাবারদাবার, জিনিস-টিনিস গুছিয়ে তুলল বেঙার লাল মোটর গাড়িটার পেছনের কেরিয়ারে। তারপর দু-জনে গাড়ি ছোটাল—পোঁক পোঁক—ভোঁক ভোঁক।

উঁচু-নীচু পথে গাড়ি চলেছে ধোঁওয়া উড়িয়ে, গড়গড়িয়ে। চেঙা-বেঙা গান ধরল গলা ছেড়ে।

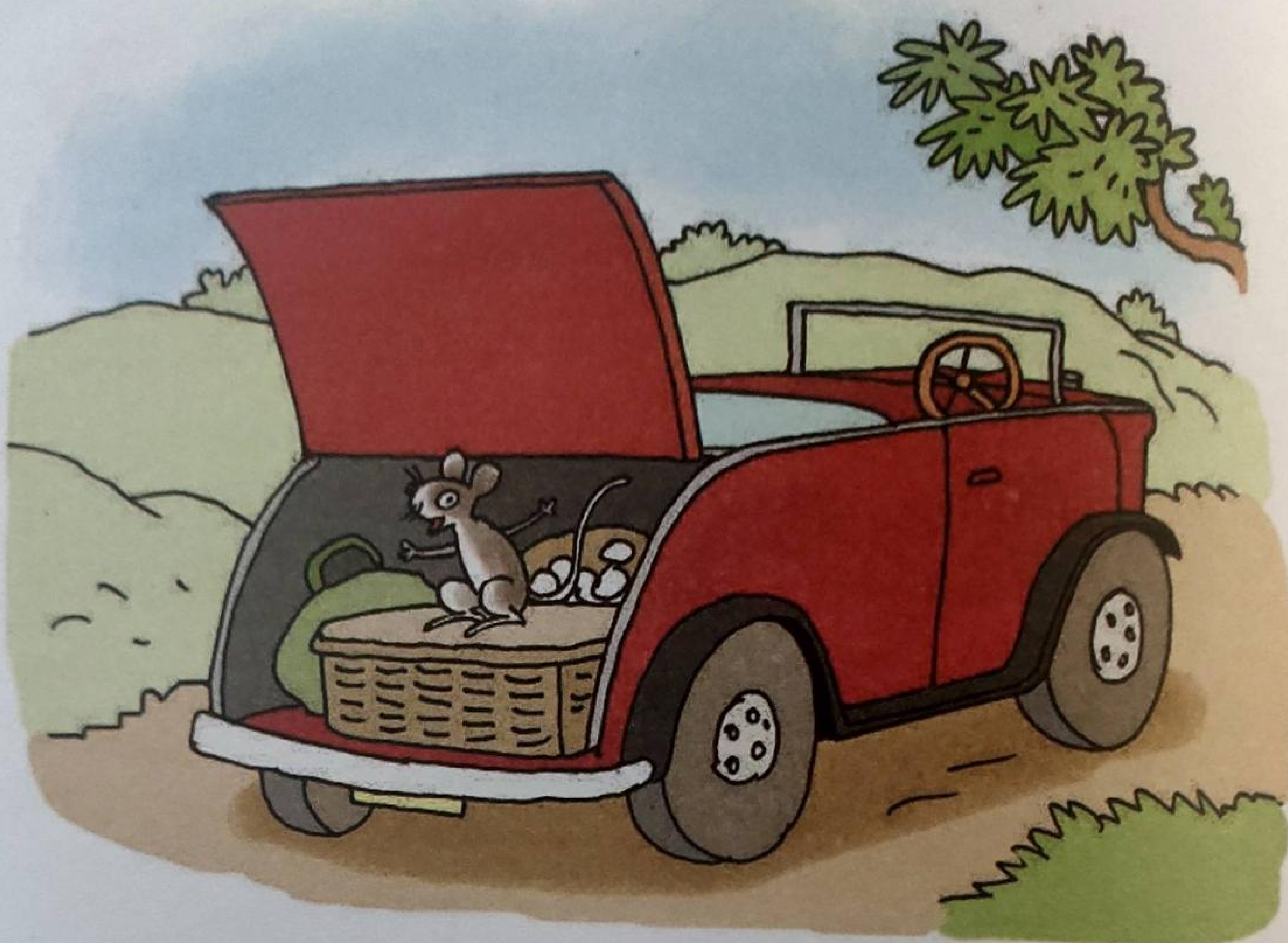
বেশ খানিকটা দূরে পোঁছেছে গাড়িটা। হঠাৎ তেমন সময় শুরু হল গাড়ির ভেতরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ-কিঁচ কিঁচ আওয়াজ! চেঙা-বেঙা দু-জনেরই চোখ ছানাবড়া!



চেঙা-বেঙার গাড়ি যত না চলে, তার চেয়ে বেশি আওয়াজ হয় কিঁচ কিঁচ-ক্যাঁচ ক্যাঁচ। শেষমেশ তাই ওরা ভয় পেয়ে নদীর ধারে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে বেঙা ঢুকল গাড়ির তলায়। কোথায় কী বিগড়াল, তাই দেখতে।

চেঙা এটা খুলে, ওটা তুলে খুঁজতে লাগল আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে! খুটখাট ঠুকঠাক কত কেরামতি! কিছুতেই কিছু না! গাড়ি না চালাতেই আবার সেই আওয়াজ—কিঁচ কিঁচ-ক্যাঁচ ক্যাঁচ।

চেঙা বলল—"বেঙা দাদা! কল বিগড়ায়নি গাড়ির ভেতরে ভূত ঢুকেছে।"



চেঙা-বেঙা দু-জনেই বেজায় হয়রান। কালি-ঝুলি মেখে একশা! চেঙার মুখে ভূতের নাম শুনে ভয় পেল বেঙা। গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এল। মাথা চুলকিয়ে বলল—"ঠিক বলেছিস রে চেঙা—ভূত ব্যাটা পাঁউরুটি আর ডিম খেতে এসেছে। আর দেরি নয়—খাবারগুলো বার কর।"

চেঙা আর কী করে! খাবারের লোভে ভয়ে ভয়ে গাড়ির পেছনের ঢাকনাটা খুলল। ওমা! ভূত নয়, অদ্ভূত ব্যাপার! ন্যাংলা নেংটি উবু হয়ে বসে কিঁচ কিঁচ করছে। আর বলছে—"হুঁ-হুঁ বাবা! ছোটো বলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পিকনিক করা চলবে না!"



ন্যাংলা নেংটি চেঙা-বেঙার চেনা-জানা। কাজেই এরপর ফাঁকি দিয়ে চেঙা-বেঙা কী করে পিকনিক করে! তা ছাড়া ন্যাংলার মাথায় রকমারি মতলব। চেঙা-বেঙাকে সে কি কম হয়রান করেছে! তাই চেঙা-বেঙা নেংটিকে তাড়াল না, চটাল না। দিল ওকে পাঁউরুটির ছোটো একটা টুকরো—আর এতটুকু একটা ডিম। নিজেরা কিন্তু নিল দিব্যি পাত সাজিয়ে বড়ো বড়ো ডিম। বেশি বেশি পাঁউরুটি, ল্যাংচা, গজা, চমচম! শরবত!

গাছের ডালে বসে কগাই কাগা দেখছিল চেঙা-বেঙার রকম-সকম। ওদের একচোখামি দেখে কাকটা অবাক! বড়ো যারা, তাদের এমন ছোটো ব্যবহার!



পুঁচকে নেংটি এতটুকু একটা ডিম পেয়েই ভারি খুশি! অমন করে পাঁউরুটি আর ডিম এর আগে কক্ষনো সে তো খায়নি! ছোটো ছোটো দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খেতে লাগল যা পেয়েছে তাই। চেঙা-বেঙাও বড়ো মুখ করে বড়ো ডিমে কামড় বসাল।

ডিমে কামড় দিতেই চেঙার চোখ ট্যারা। বেঙার বদন বাঁকা। দু-জনের দুটো ডিমই পচা! ওয়াক থুঃ! চেঙা-বেঙা দু-জনেই যে-যার ডিম ছুড়ে ফেলে দিল রেগে-মেগে। বেঙার ছুড়ে ফেলে দেওয়া পচা ডিমটা লাগল গিয়ে কগাই কাগার কালো ঠোঁটে। কগাই কাগাও রেগে ওঠে। পচা ডিম মুখে দিয়ে চেঙা-বেঙার মুখ খারাপ। পেটের নাড়িভুঁড়ি



সব ওলটপালট! খাবার যা পেটে ছিল—বমির চোটে তাও উঠে গেল! চেঙা-বেঙা খাবার ফেলে মুখ ধুতে ছুটল ঘাসি ডোবার ধারে। গিয়ে দেখে—ডোবার বাসি জল যেমন ময়লা, তেমনি পচা। চেঙা-বেঙা ভাবে মুখ ধুই কি, না ধুই?

ওদিকে কগাই কাগা রাগের চোটে কাকের দলকে ডেকে আনল। বলল, "কা-কা। খা-খা-খা।" কাগেরা পাঁউরুটি চমচমের হরির লুট লাগিয়ে দিল।

নেংটি চেঁচাতে লাগল—"চেঙা দাদা, বেঙা দাদা ঝটপট এসো, চটপট করো,—কাগেরা সব খেয়ে গেল।"



ন্যাংলা নেংটির হাঁকডাক শুনে চেঙা-বেঙা পড়ি কি মরি দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এল গাছতলাতে। মুখ ধোওয়া আর হল না। ফিরে এসে দেখে—দু-জনেরই খালি পাত! শরবতের গেলাস কুপোকাত! মাথার ওপর কাকেরা উড়ছে পাঁউরুটি নিয়ে!

কগাই কাগা হি-হি করে হাসছে আর বলছে, "কা-কা-কা চেঙা-বেঙা খাবি খা!" কাকেদের ডাকাতি দেখে চেঙা দিল গালে হাত। বেঙা একদম জগন্নাথ।

ন্যাংলা নেংটি ঘাবড়াল না। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেংটি চেঁচাতে লাগল—"হেই! হেই কালটি কাগ! ভালো চাস তো এখুনি ভাগ!"



ন্যাংলা নেংটির তাড়া খেয়ে কগাই কাগার দল ভাগল না কেউই; উলটে কাগার দল পালা করে ঠোকরাতে লাগল বেঙার টাকে। বেঙা বেচারা পালাতে গিয়ে পা পিছলে আলুর দম। পিকনিক করতে এসে কত খাবে—না আছাড় খেল। পা ছড়িয়ে বেঙা কাঁদতে বসল।

চেঙা তাড়াতাড়ি রুমাল বার করল। বেঙার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল—"কেঁদো না, কেঁদো না বেঙা দাদা! ঘরে গিয়ে খেয়ো ছোলা আদা।"

নেংটি বলল—"কাছেই আমার মেঠোমামার বাড়ি। বল তো ওখান থেকে কিছু খাবারদাবার নিয়ে আসি।"

বেঙা বলল—"যাঃ যাঃ এখুনি যা।"



বেঙার হুকুম পেয়েই নেংটি ছুটল পাঁই পাঁই, সাঁই সাঁই—মামার বাড়ির দিকে। নেংটি যখন অনেক দূরে গেল, চেঙা তখন বেঙার আরও কাছে এল। বলল—"চ্যাংড়া আপদ বিদেয় হল—হাড় জুড়োল। চলো গিয়ে গাড়ি চড়ি—এই ফাঁকে সরে পড়ি। নেংটিটাকে আমরা এবার নাকাল করি।"

বেঙা বলল—"মতলবটা তোর ভালোই কিন্তু আমার যে খিদেয় পেট কনকন—গা-গতর টনটন। গাড়ি চালাবার জোর কই!"

চেঙা বলল—"ডোনটু কেয়ার কানাকড়ি আমিই এবার চালাব গাড়ি।"

চেঙা-বেঙা গাড়ি ছোটাল বাড়ির দিকে।



মামার মাথায় খইমুড়কি-ভরতি ইয়া বড়ো এক ধামা চাপিয়ে নিয়ে নেংটি সেই গাছতলায় ফিরে এল। এসে দেখে গাছের গায়ে একটা কাগজে লেখা, "আমরা বাড়ি ফিরলুম। পা-গাড়ি চড়ে তুমি পরে এসো। ইতি—চেঙা-বেঙা—" লেখাটা পড়ে নেংটি অবাক।

মেঠোমামা নেংটিকে বলল—"কোথায় রে তোর চেঙা-বেঙা?"

নেংটি দেখতে পেল—দূরে এক জায়গায় ধোঁয়া উঠছে। আওয়াজ আসছে মোটরের ভট ভটর ভট। মামাকে বলল—"হাই দেখো চেঙা-বেঙার গাড়ি। আবার বোধ হয় বিগড়িয়েছে। পা চালিয়ে চলো মামু তাড়াতাড়ি।"

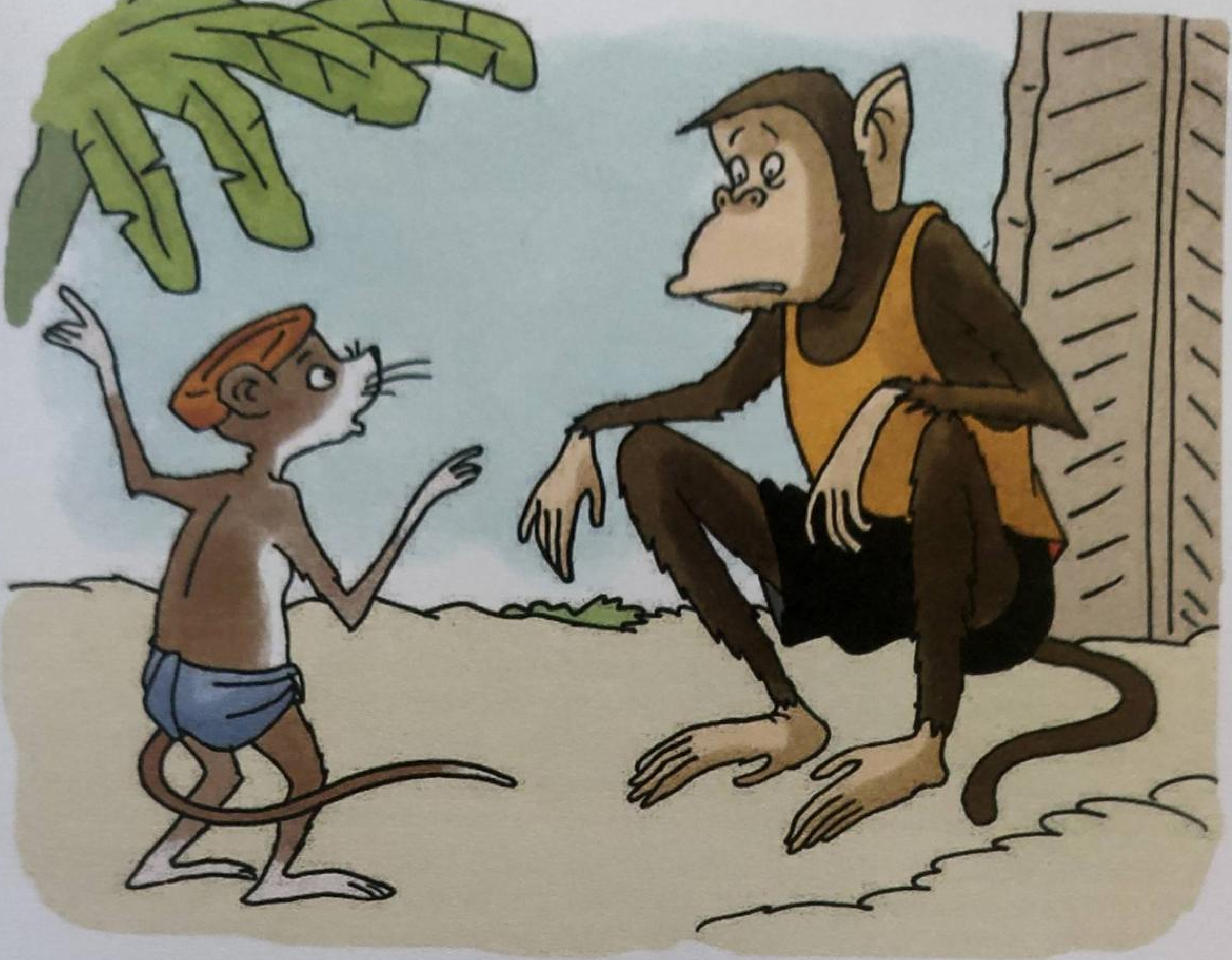
ন্যাংলার মেঠোমামা মাঠে থাকে—মোটর গাড়ি কখনো চোখে দেখেনি। তাই নেংটির পেছন পেছন সেও দৌড়োল ধোঁয়ার নিশানা ধরেই। পৌঁছোল ওরা ঠিক জায়গাতেই।



ওখানে হাজির হয়ে নেংটি দেখল—ভীষণ ব্যাপার। নাক-মুখ থেবড়ে মোটর গাড়ি কুপোকাত। বেঙা মাটিতে চিতপাত! চেঙা হাঁউমাউ করে কাঁদছে। নেংটি বলল—"মামা, ধামা নামাও—ভয়ানক বিপদ! ভীষণ এ্যাক্সিডেন!"

মেঠোমামা বলল—"ভাবিসনে তুই—এক্ষুনি ডেকে আনছি টুলকুকে।" নেংটি ভাবে—টুলকু! সে আবার—কে রে বাবা!'

টুলকু হল ঝুমরো বেদের পোষা বাঁদর। নেংটির মেঠোমামা খইমুড়কির ধামা নামিয়ে দৌড়োল তার কাছেই। কারণ মেঠোমামা জানে বেদের বাঁদর টুলকু ভারি চালাক। বেদের সঙ্গে সঙ্গে ছগুয়া ছাগলার পিঠে চড়ে টুলকু ইনগাঁ-ভিনগাঁ কত গাঁয়ে যায়! নাচ দেখায় পয়সা কামায়। বেদের ঘরে থাকে। তাই ওষুধ-বিষুধের খবরও রাখে। পাড়ার কারুর অসুখ-বিসুখ হলে মেঠোমামারা তার কাছেই যায়। জড়িবুটি—ঝাড়-ফুঁক দিয়ে টুলকুই তো তাদের রোগ বালাই সারায়। মেঠোমামা তাই বেদের বাড়ি হাজির হয়ে টুলকুকে চেঙা-বেঙার বিপদের কথা বলল। টুলকু সব মন দিয়ে শুনল।



ওদের বিপদের কথা শুনে টুলকু স্থির থাকতে পারে না। ভাবল শহরওয়ালারা বনপাড়ায় এসে বিপদে পড়েছে। আর সে বিপদের বিহিত করতে, মেঠোমামা যখন ছুটে এসেছে তার কাছেই, তখন একটা কিছু উপায় তো করতেই হয়। টুলকু ভাবে—বেঙাকে হয়তো কোনো রকমে বাঁচানো যাবে। তবে বিগড়ানো মোটর চালু করার তাগ-বাগ তো তার জানা নেই। সেটার কী করা যায়!

হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল ধোবাবাড়ির গবার কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সটাং ধোবাবাড়ি গেল টুলকু। বেড়ায় বাঁধা ছিল গবা গাধা। গলার দড়ি খুলে টুলকু তাকে নিয়ে চলল—চেঙা-বেঙার কাছে।



টুলকু বাঁদর আর গবা গাধাকে নিয়ে মেঠোমামা আসছে দেখে—নেংটি আর চেঙা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—কিন্তু বেঙা বেহুঁশ যেমনকার তেমনি। যাক টুলকু এসেই গেরেম্ভারী চালে বেঙার পেট টিপল, গায়ে চিমটি দিল। তবু বেঙা নড়ে না চড়ে না।

টুলকু বলল—"ভয় ভাবনার কিছু নেই—ওনার দম ফুরিয়ে গেছে। এখনই একটা শালুক ডাঁটা চাই, দম দিতে হবে।"

মেঠোমামা ঝট গিয়ে পট করে একটা শালুক ডাঁটা এনে দিল—ভালুক ডোবা থেকে। শালুক ডাঁটার একটা দিক বেঙার মুখে ঢুকিয়ে টুলকু খুব জোরসে ফুঁ লাগায়। মেঠোমামা, নেংটি আর চেঙা—ওদের সকলের তাক লেগে যায়।



টুলকুর ফুঁয়ের চোটে বেঙার পেটে আবার দম ভরে ওঠে। বেঙা হাই তোলে, চোখ খোলে। শেষটায় আড়মোড়া ভেঙে গা-ঝাড়া দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। চোখের সামনে অচেনা টুলকুকে দেখে বেঙার চোখ ট্যারা।

চেঙা হেসে বলে—"ভয় পেয়ো না বেঙা দাদা। ইনি আমাদের নতুন মিতে টুলকু। উনিই তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।"

বেঙা বলল—"সবে তো উঠে বসলুম, বাঁচলুম কই! গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরলে তবে বাঁচব।"



টুলকু বলল—"বেঙা দাদা তাই হবে, গাড়ি নিয়েই বাড়ি যাবে। খইমুড়কি এনেছে মামা—এখন কি ভাই ফলার খাবে?"

ফলারের নামে বেঙা চাঙা। দুধ নেই, দই নেই—শুকনো ফলারই খেতে লাগল গবগবিয়ে। নেংটি, টুলকু, চেঙা, মেঠোমামা ওরাও দু-এক মুঠো খইমুড়কি খেল।

তারপর সবাই কাত-হয়ে-পড়া গাড়ির কাছে হাজির হল। গাড়ি তো তেবড়ে-তুবড়ে একশা। কী করা যায়! নেংটি বলল—"ভাবনা কী, সবাই মিলে জোরসে ঠেলো, আর বলো সবাই 'হেঁইয়ো', 'হেঁইয়ো'।"



চেঙা, টুলকু, মেঠোমামা সবাই মিলে জোরসে ঠেলতে লাগল বেঙার মোটর গাড়িটাকে। আর নেংটি বলতে লাগল 'হেঁইয়ো জোয়ান, মারো ঠেলা!"

ওরা বলে,—হেঁইয়ো, আউর ভি থোড়া হেঁইয়ো।"

অনেক ঠেলাঠেলি করবার পর গাড়ি তো কোনো রকমে খাড়া হল। গাড়ি উঠে দাঁড়িয়েই বলল—"দেখো বাছারা—কল-টল আমার সব বিগড়ে গেছে—চলতে আমি পারব না আর নিজের জোরে। পার তো টেনেটুনে নিয়ে চলো।"



টুলকু বলল—“বেশ! বেশ! তাই হবে! গবা গাধাটাকে তাইতো নিয়ে এসেছি।” টুলকু তাড়াতাড়ি গবার লেজের গেরো দিয়ে গাড়িটাকে বেঁধে দিল। চেঙা গাধার পিঠে চড়ে বসল। বেঙাকেও টুলকু তুলে দিল গাধার ওপর উলটো দিকে মুখ করে। নেংটি চড়ল গিয়ে গাড়িতে। বেঙাকে উলটো গাধায় চড়িয়ে টুলকু আর মেঠোমামা হাত নেড়ে বলল—“টা-টা গুডবাই!”

নাকাল নেংটি





চেঙা-বেঙা পিকনিক করতে গিয়ে কত যে আপদ-বিপদে পড়েছিল, সে কথা আর সবাই ভুলে গেলেও চেঙা-বেঙা তো ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না পুঁচকে নেংটি সেদিন তাদের কত উপকার করেছে।

তাই সেই উপকারের কথা মনে করে ক-দিন পরেই চেঙা-বেঙা ঠিক করল নেংটিকে বেঙার বাড়িতে এনে খাওয়াবে। তারিফ জানাবে তার বাহাদুরির। নেংটিকে চিঠি লিখল এই কথা জানিয়ে।

বাদুড় পিয়োন রাতের আঁধারে চুপিচুপি চিঠিটা রেখে গেল, লাল টুকটুকে লেপের ওপরে। ঘুম ভাঙতেই নেংটি চেঙা-বেঙার চিঠি পড়ে যেমন অবাক, তেমনি খুশি। তাড়াতাড়ি উঠে চোখ-মুখ ধুতে গেল।



ইজের-জামা না পরে অন্য বাড়িতে খেতে যাওয়া চলে না। নেংটি তাই সাজতে বসল আয়নার সামনে। অত সকালে দাদাকে সাজপোশাক করতে দেখে নেংটির ভাই-বোন—চেংটি, ভেংচি আর চিমটি ছুটে গিয়ে মাকে ওই খবরটা দিল। ঘরে এসে মা দেখেন, নেংটি টেরি বাগিয়ে মুখে খাবোল খাবোল পাউডার মাখছে।

নেংটির মা বললেন—"হ্যাঁরে নেংটে, ব্যাপার কী?" নেংটি তখন মাকে চেঙা-বেঙার চিঠি দেখাল, বলল সব কথা। মা সব শুনে বললেন—"চেঙা-বেঙা বড়োলোক। বেঙার বাড়ি গিয়ে সামলে-সুমলে চোলো বাছা।"

নেংটি বলল—"ওসব তুমি ভেবো না মা।"



মায়ের হুকুম পেয়ে নেংটি বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ওদিকে ছুঁচো পাড়ার ছেঁচকিও একটা নতুন তিন চাকার সাইকেল চালিয়ে চলেছে।

নেংটিকে দেখে সে সাইকেল থামাল। বলল, "কোথায় চলেছিস এত সেজেগুজে?"

নেংটি খুব চাল দেখিয়ে বলল, "বেঙার বাড়িতে ভোজ খেতে।"

ভোজ খাওয়ার নামে ছেঁচকির জিভে জল এল—বলল, "বেশ! বেশ! চল তোকে আমার সাইকেলে চড়িয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

নেংটি মহাখুশি—চড়ে বসল ছেঁচকির সাইকেলের পেছনে। ছেঁচকি বেপরোয়া সাইকেল চালিয়ে ছুটল। হাঁসু-মাসু আর টিকটু তাই দেখে আঁতকে পালাল।



কুতকুত কাঠবেড়ালি রগড় দেখবার জন্যে হাঁসুকে ডেকে নিল। ওদের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। চেঁচাতে লাগল—"ন্যাংলা ভায়া, নেমে পড়ো—ছেঁচকি ছুঁচো দিনের বেলায় চোখে দেখে না। অঘটন ঘটিয়ে ছাড়বে।"

নেংটি ভাবে, হিংসুটে ওরা। তাই ভয় দেখাতে মিছিমিছি অমন সব কথা বলছে। ছেঁচকিও রেগে-মেগে আরও জোরসে গাড়ি ছোটাল—সামনেই যে ডোবা, সেদিকে খেয়াল নেই। গাড়ি ছুটছে সাঁই সাঁই। নেংটিও আঁতকে উঠল—বলল—"থামাও থামাও, দোহাই দাদা আমায় নামাও।"

গাড়ি আর থামবে কী! গড়গড়িয়ে পড়ল গিয়ে ডোবায়।



ভাগ্যিস নেংটি সাইকেলের পেছনে ছিল, আর ডোবাতেও জল ছিল কম, তাই খুব বেঁচে গেল। ছেঁচকি আর তার সাইকেল ডোবার পাঁক-কাদায় যখন হাবুডুবু, নেংটি তখন একলাফে ডাঙায় পড়ল। ছুটল—পাঁই পাঁই, সাঁই সাঁই। বুঝল পরের গাড়ি চড়ে বড়োমানুষি দেখানোর চেয়ে নিজের পায়ে হেঁটে চলাই ভালো । হাঁটতে—হাঁটতে—হাঁটতে নেংটি শেষটায় বেঙার বাড়ির কাছে পৌঁছোল। দেখল বাড়ির সামনে চেঙা-বেঙা গেট তৈরি করেছে। সাজিয়েছে খাসা! ‘গ-ম্-স্বা-ত’ কথাটা বড়ো বড়ো হরফে লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছে।



কথাটার মানে নেংটি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। শেষটায় নেংটি বুঝতে পারল—চেঙা-বেঙা বড়োলোক। তবে তেমন লেখাপড়া জানে না—তাই 'স্বাগতম' কথার চারটে হরফ ওলটপালট করে সাজিয়েছে। চেঙা-বেঙার ভুলটা শুধরে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না নেংটি।

কাছেই ছিল একটা কাঠের সিঁড়ি, সেটা টেনে নিয়ে এল। ছিটকিনি না লাগিয়েই, তড়বড়িয়ে তার ওপরে উঠল। 'স্বা'-'গ'-'ত', ঠিক জায়গায় বসিয়ে হাত-পা ছুড়ে নাচ জুড়ে দিল সিঁড়িটার ওপরেই।



নাচের গুঁতোয় ছিটকিনি-খোলা মই বেটাল। বিদ্যে জাহির করে দেমাক দেখাতে গিয়ে নেংটি পড়ল ছিটকে। চেঙা ছুটে এসে সিঁড়িটা ধরে ফেলল।

ভাগ্যিস চেঙা ছুটে এসে সিঁড়িটা ধরে ফেলেছিল! তা না হলে নেংটি মই চাপা পড়েই পটল তুলত। নেংটি মই থেকে পড়ে মরল না বটে, তবে হাত-পা মুখ-মাথায় চোট লেগেছে। কেটে-কুটে ফুটিফাটা। তখন তখনই বেহুঁশ! চেঙা-বেঙা তখুনি তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ঘরে। বাতাস করে জল ঢেলে, তবে নেংটির কাটা-ঘা ধুইয়ে—মলম-পটি লাগিয়ে দিল।

নেংটির কাঁদবার উপায় নেই। মুখ বুজে সব সইতেই হয়।



মলম-পটি লাগিয়ে, গরম দুধ খাইয়ে চেঙা-বেঙা নেংটিকে তখনি খাড়া করে তুলল। নেংটি তবু খুব মনমরা। মায়ের কাছে কী করে মুখ দেখাবে। বাড়ি ফিরলে ভাই-বোনেরা টিটকারি দেবে, মা-বাবা বকুনি লাগবে। বেচারা ভেবে পায় না কী করে! কোথায় যায়! বুঝতে পারে ছোটো হয়ে বড়োদের ভুল শোধরাতে গিয়েই এই বিপদ। নেংটি হঠাৎ বলে বসে— "আজ বাড়ি যাই, আর একদিন আসব'খন।" চেঙা-বেঙা বলে—"আরে! তাও কি কখনও হয়! অত মন খারাপ করার কী আছে? কলের গান শোনো। আমরা বাজারটা সেরে আসি।" কলের গানে রেকর্ড চড়িয়ে চেঙা-বেঙা বলল—"টা-টা, গুডবাই।"



কলের গানে রেকর্ড চড়িয়ে দিয়ে চেঙা-বেঙা বাজার করতে গেল। নেংটিও গান শুনে ভুলে গেল ঘায়ের টনটনানি। কলের গানের সুরে গলা মিলিয়ে সে গান ধরল। গান শেখার তার ভারি শখ—কিন্তু বাড়িতে গুনগুন করলেই—মা-বাবা সবাই ধমক লাগায়। ভাই-বোনগুলো ভেংচি কাটে। সে সব ঝামেলা ওখানে নেই। নেংটি তাই মনের সুখে গলা ছাড়ল। রেকর্ডের গান শেষ হতেই আপনা থেকে কলের গানটা থেমে গেল। নেংটি তাতে ঘাবড়াল না একটুও। তুড়ুক করে কলের গানের রেকর্ডের ওপর লাফিয়ে উঠে চেঙা-বেঙার মতোই আবার শুঁড়-চাকিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল।



ওমা! ওটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে এনে বসাতেই—নেংটিকে নিয়েই রেকর্ডখানা বাঁই বাঁই করে আবার ঘুরতে শুরু করল। গানও বেজে উঠল গ্যাঁক গ্যাঁক করে! নেংটি যে নেমে পড়বে—সে উপায় রইল না। নেংটিও রেকর্ডের সঙ্গে আনিমানি খেয়ে খুব ঘুরতে লাগল। ভয়ে চেঁচাতে লাগল—তবে গানের গুঁতোয় তার হাঁকডাক চাপা পড়ে গেল। কেউ শুনতে পেল না নেংটি কাঁদছে। কেউ ছুটে এল না তাকে বাঁচাতে। রেকর্ডের ঘুরপাকে পড়ে নেংটি ঘুরছে তো ঘুরছেই। ঘুরুনির চোটে নেংটির গায়ের মলম-পটি ছিটকে ছোটে। চোখের সামনে তারা ফোটে।



কলের গানের রেকর্ডের ওপরে চেপে নেংটি ঘুরছিল বাঁই বাঁই করে। তাই সে দেখল ঘরের চেয়ার-টেবিল, খাট-পালং সবই ঘুরছে চারধারে। ঘুরুনির চোটে বেচারার গা-মাথা বেসামাল, শেষটায় চোখ দুটোতে ঝাপসা দেখতে লাগল। হঠাৎ গোঁ-গোঁ করে গান ফুরিয়ে গেল! ঘ্যাচাং করে থেমে গেল কলের গান। আর তার হাঁচকা ঝাঁকুনি খেয়ে পুঁচকে নেংটিও ছিটকে গেল জানলা গলে বাইরে।

জানলার বাইরে গিয়েও নেংটি ঘুরছে। ঠিক যেন উড়ন চরকি। ঘুরতে ঘুরতে চলল হাওয়ায় ভেসে।



জানলার বাইরে পাতাবাহার, ফলসা গাছ। ফলসাতলায় পাখিদের গানের জলসা চলছিল। গান ধরেছে কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাচা, ছাতারে, চড়ুই-মড়ুই পাখির দল। কাঠবেড়ালিদের নিয়ে ওরা 'নববর্ষে'র উৎসব করছিল। কিচিরমিচির কনসার্টের তালে পাখিদের গান। কাঠবেড়ালিদের লেজখাড়া নাচ।

ঠিক তেমন সময়, ঘুরতে ঘুরতে নেংটি পড়ল গিয়ে তাদের মাঝখানে। কাঠবেড়ালি আর পাখির দল সরে দাঁড়াল। ব্যাপার দেখে সবাই ওরা হকচকিয়ে উঠল। মাটিতে পড়েও নেংটি বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল—চরকি বাজির মতো।



নেংটিকে চরকির মতো ঘুরতে দেখে পাখির দলের ভয়-ভাবনা ঘুচল। পাখিরা ভাবল—কেউ বুঝি ওদের জলসায় নাচতেই এসেছে। ওমা! ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ নেংটি চিতপাত! পড়েই বেহুঁশ! শুরু হল হাত-পা খিঁচুনি।

চোখ কপালে উঠল নেংটির। কাঠবেড়ালিগুলো তাই দেখে চোঁচা দৌড় দিল। ভয়ে চ্যাংড়া চড়ুই চেঁচাতে লাগল—"মরে গেল! হায় কী হল!" চিটকে চড়ুই বলল—"খামোখা চেঁচিয়ো না—মরেনি, হুঁশ হারিয়েছে। নদীতে নিয়ে গিয়ে মাথায় জল দিলেই হুঁশ ফিরবে। এসো, সবাই ঠোঁট লাগাও। নিয়ে যাই ওকে নদীর ধারে।"



চিটকে দেখতে ছোটো। তবে—চড়ুইদের ভেতর ওই সবচেয়ে চালাক। ও যেমনি ছটফটে তেমনি চটপটে। চড়ুইরা সবাই তাই ওকে খুব মানে। চিটকের হুকুমমতো তখুনি পাখিরা নেংটির জামায় ঠোঁট লাগাল। অনেক টানাটানি ঠেলাঠেলির পর, চড়ুইরা নেংটিকে নিয়ে উড়ল। জোড়া জোড়া ডানা ঝাপটে তুলল আকাশে। শহর থেকে নদী অনেক দূরে। পাখিরা চলল হেঁতুল-তেঁতুল তাল-শাল গাছ ডিঙিয়ে—নেংটিদের বাড়ির ওপর দিয়ে। নীচে নেংটির ভাই-বোনেরা চেঁচাতে লাগল—"উড়োজাহাজ, উড়োজাহাজ!"



পাখিরা উড়ে চলেছিল নেংটিকে নিয়ে নদীর দিকে। গোল বাধাল আকাশের ওপরে কনকনে জলো-হাওয়া। নেংটির গায়ে-মাথায় ফুরফুরে হাওয়া লাগতেই তার হুঁশ ফিরে এল। চমকে উঠে তখুনি চোখ খুলল নেংটি। দেখে তার চারপাশে মেঘেরা ছুটোছুটি করছে। আর, এক দল পাখি তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সর্বনাশ! এ কী ফ্যাসাদ। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, নেংটি ভেবে পায় না। খানিকটা চুপ করে রইল। তারপরেই নেংটি হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগল। পাখিরাও ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল নেংটিকে। নেংটির জাঙিয়ার পা দুটো ফুলে উঠল উড়োছাতার মতো।



ভাগ্যিস, জাঙিয়ার পা ফুলে উড়োছাতা হয়ে গেল। নইলে বাছাধন বুঝত মজাটা! ডিগবাজি খেয়ে আর তালগোল পাকিয়েই নীচে পড়তে হত। সেটা আর ঘটল না। তবে সোজা নামতে লাগল নীচের দিকে—হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। নেংটির চোখ তখন কপালে উঠেছে! কিছু করবার উপায় নেই! কিছু ধরবার উপায় নেই! নামতে নামতে শেষটায় নেংটি টুপ করে পড়ল এক মুটের মাথায়, বাজার-ভরতি ঝাঁকায়। পড়তেই শুয়োর সিং মুটের মাথায় ঝাঁকুনি লাগল। একটু শুধু সে চমকে উঠল। তবে টের পেল না আসল ব্যাপারটা।



মুটের ঝাঁকার মাঝখানে ছিল পালংশাক, কমলালেবু, পাঁউরুটি। আকাশ থেকে নামতে নামতে সোজা তারই ওপরে পড়ল নেংটি। তাই সে জখম হল না। লাগল না এতটুকু চোট কোথাও। মুটের ঝাঁকায় বসে নেংটি দেখল—চেঙা-বেঙা চলেছে আগে আগে। নেংটি বুঝল তার ভোজের সওদাতেই ঝাঁকা ভরতি। নেংটি যখন বেঙার বাড়ির কাছ বরাবর এসে পৌঁছোল, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা ঠোঙা। তার ভেতরে দিব্যি লাল টুকটুকে কাগজে মোড়া টফির মতো কী যেন সব রয়েছে। নেংটি লোভ সামলাতে পারল না। ঠোঙায় হাত ঢুকিয়ে তারই একটা তুলে নিল।



লাল টুকটুকে কাগজে মোড়া জিনিসটা নেংটির একেবারে অচেনা। তাই সে সেটা টিপেটুপে দেখতে লাগল। নাকের কাছে এনে ওটা শুঁকল বার দুই। দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের মতো। কামড়ে দেখে নেংটি, পেঁয়াজ তো নয়! ভেতরে কচকচে পাথরের কুচি। তাই নেংটি রেগে-মেগে ঠোঙাটা তুলে নিয়ে ঝুড়ির একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল।

ঠোঙায় ছিল বোমা, ভুঁই পটকা। ব্যস! অমনি দুম-দাম করে ফাটল সেগুলো। ভুঁই পটকার ঝটকায় আলু, কপি, চিংড়ি মাছ—সব ছিটকে গেল চারধারে। নেংটিও খেল ঝট্‌কান—ডিগবাজি। মুটে শুয়োর সিং চিতপটাং।



শুয়োর সিং মুটের ঝাঁকায় পটকা-বোমা ফাটতেই চেঙা-বেঙা বেজায় চমকে উঠল। পেছনে ফিরে দেখে শুয়োর সিং মাটিতে গড়াগড়ি। ঝুড়ির মাল ছড়াছড়ি। সব চেয়ে বড়ো বোমাটার ঝটকা লেগেছিল নেংটির গায়ে। ন্যাংলা নেংটি ছিটকে গিয়ে পড়ল কোথায়? বেঙার বাড়ির জানলা গলে—ধপাস করে একেবারে বেঙার খাটের ওপর। খাটের ওপর পাতা ছিল তুলোঠাসা নরম গদি। তাই একটুও চোট লাগল না নেংটির গায়ে-পায়ে। বেচারা বেজায় দিশেহারা। কোথা থেকে কীসব ওলটপালট হয়ে গেল! অথচ সে ফিরে এল আবার সেই বেঙার বাড়িতেই!

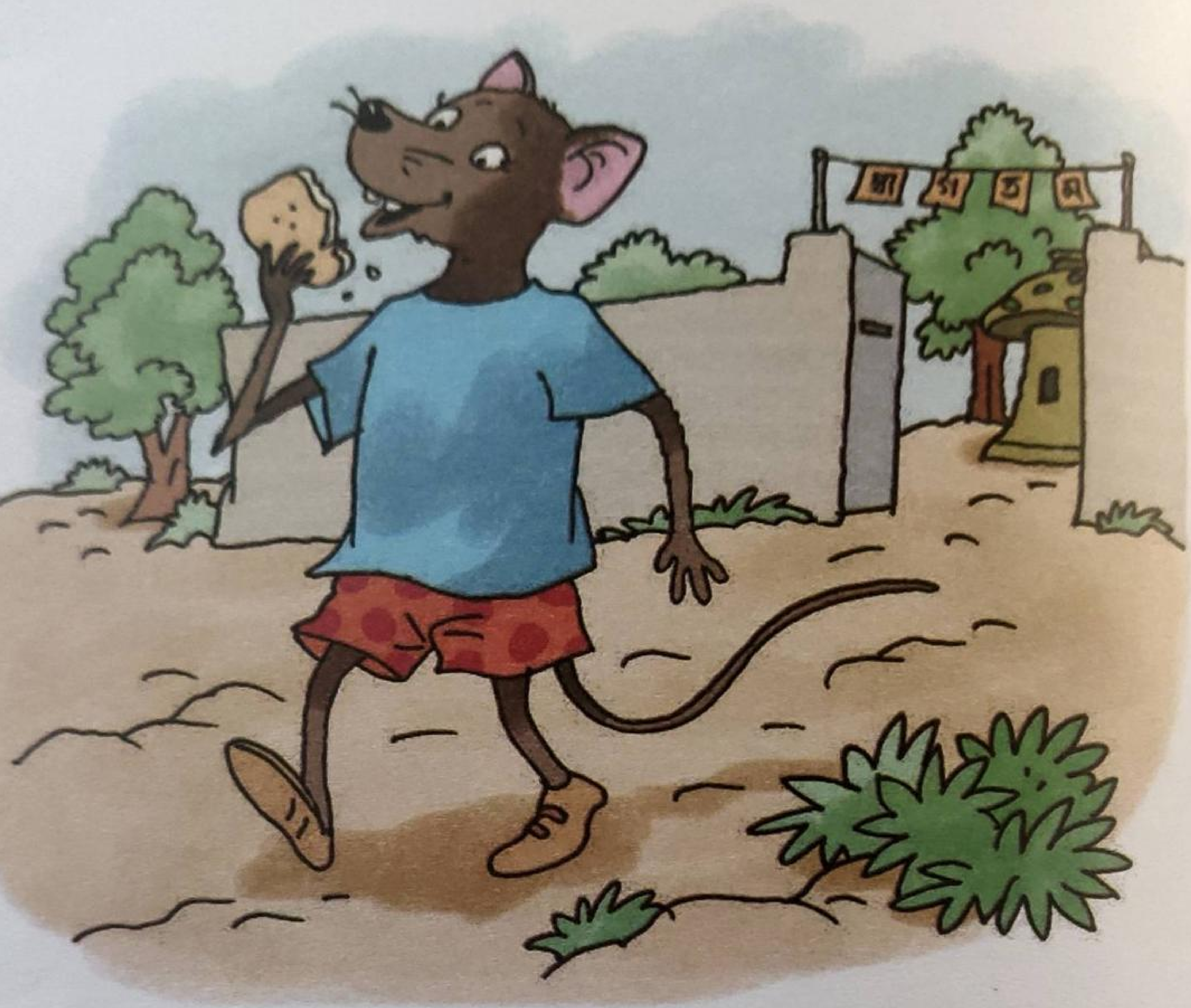
নেংটি ভাবল—এত ঝামেলার পর আবার যখন এখানেই এলুম, তখন মুখটি না খুলে চুপটি করে বসে থাকাই ভালো। দিব্যি ভালোমানুষটি সেজে বেঙার খাটের ওপর বসে রইল নেংটি। ভাবটা এই, যেন সে কিছুই জানে না।



ওদিকে চেঙা-বেঙাও দৌড়োল শুয়োর সিংয়ের কাছে। নেংটিকে খাওয়াবে বলে কত কী বাজার করে নিয়ে আসছিল। সব মাটিতে ছড়াছড়ি! কাক-চিল গোরু-ছাগলগুলো— মাছ তরকারি ভাগাভাগি করে মুখে পুরেছে।

ব্যাপার দেখে চেঙা-বেঙা ঘেঁষল না আর সেদিকে। দু-জনে খালি হাতে, মুখ কাঁচুমাচু করে ঘরে ফিরল।

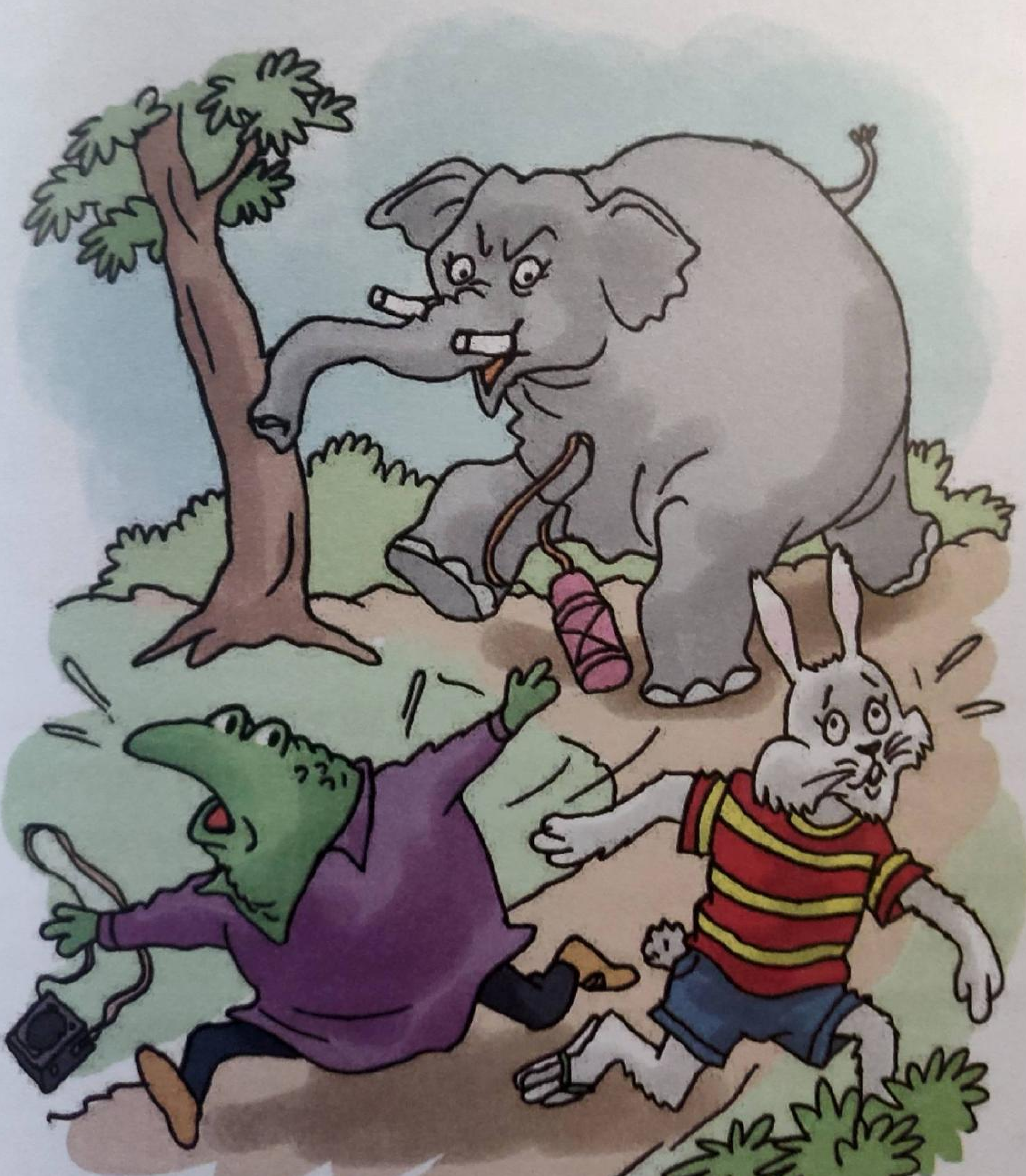
ঘরে ঢুকে চেঙা-বেঙা এ-ওর মুখ চায়। নেংটিও কী বলবে ভেবে পায় না। সবাই চুপচাপ, কেউ আর কথাটি কয় না। ঠিক তেমন সময় শুয়োর সিং মুটে ভাঙা ঝাঁকায় করে গোটাকতক ধুলোমাখা আলু আর একটা পাঁউরুটি কুড়িয়ে নিয়ে হাজির হল। শুয়োর সিং কেঁদে বলল— "বার বার মানা করলুম গো, বোমা-পটকাগুলো কিনো না। শুনলে কি আমার কথা!"



চেঙা তখন আমতা আমতা করে বলল—“তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না। কপালের দোষে আমাদের আয়োজনটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। থাকবার মধ্যে আছে এই পাঁউরুটি—এটাই তুমি আমাদের উপহার হিসাবে নাও।”

চেঙার কথা শুনে নেংটি হাঁফ ছাড়ল। যাক বাবা! ওরা টের পায়নি কেউ, আমিই যত ফ্যাসাদের গোড়া! নেংটি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পাঁউরুটিটা নিয়ে নিল। বলল—“এটা হল আমার উপহার—ওটি খাওয়া চলবে না। আলু ক-টা দিয়েই আলুর দম রাঁধো—সবাই মিলে তাই খাব।” চেঙা-বেঙা কী আর করে? বোকার মতো রসুইঘরে আলুর দম রাঁধতে গেল। নেংটিও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল—জানলা গলে। চলল বাড়ির দিকে পাঁউরুটি খেতে খেতে।

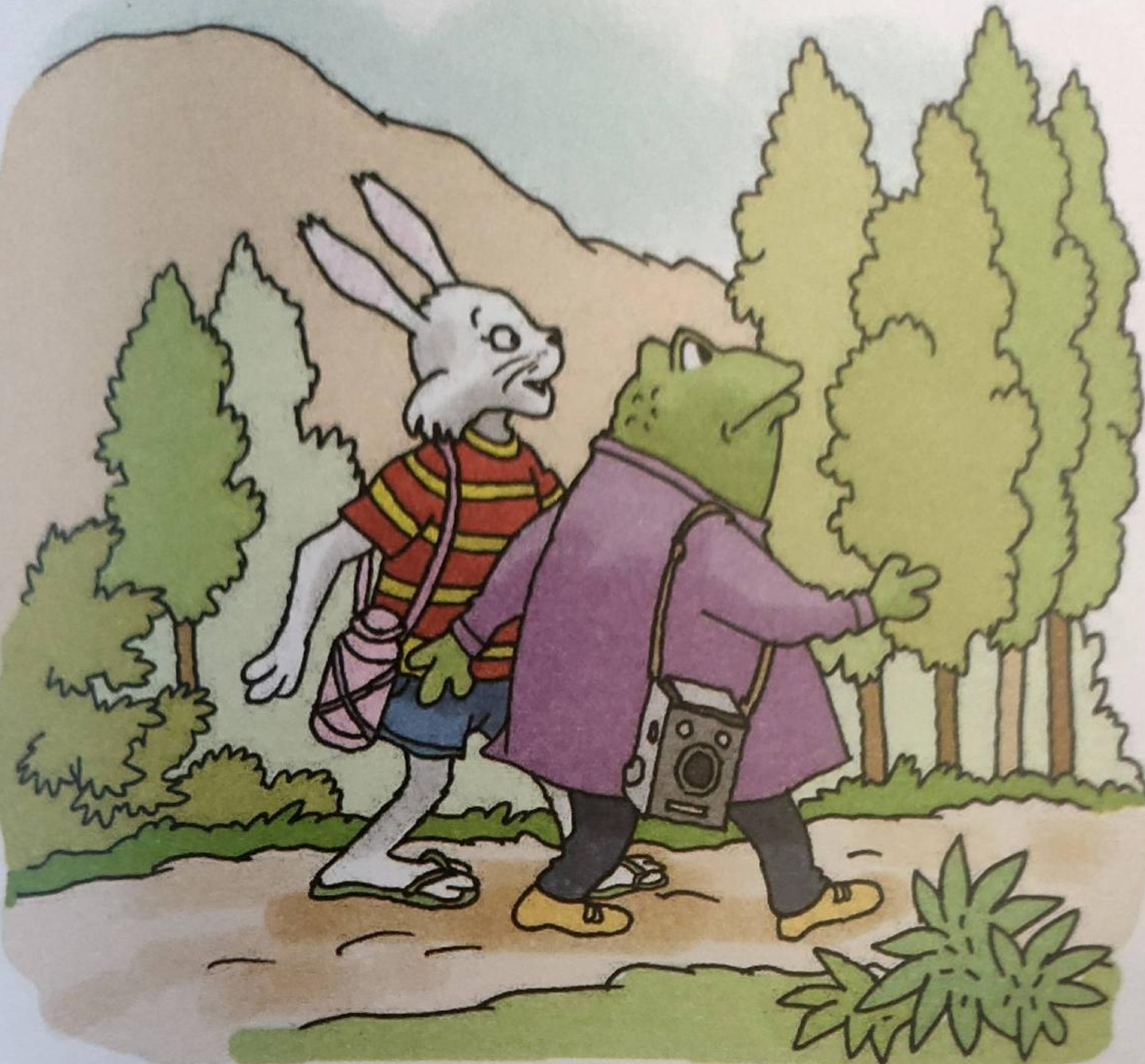
চালাক-বোকা





সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বেঙা দেখে—চেঙা হাজির। তার বগলে একখানা খবরের কাগজ! কী ব্যাপার! চেঙা বলল—"বেঙা দাদা, ভারি জোর খবর।" খবরের কাগজখানা খুলে ধরল বেঙার সামনে। বেঙাকে দেখাল—বড়ো বড়ো হরফে লেখা—ফটো প্রতিযোগিতা—ভালো ফটো তুলে পাঠাতে পারলে পাঁচ হাজার, দু-হাজার নয়তো কম সে কম এক হাজার টাকাও মিলতে পারে। চেঙা বলল—"বেঙা দাদা তোমার ক্যামেরাটা বার করো। চলো বেরিয়ে পড়ি দু-জনে ফটো তুলতে।"

বেঙা ভেবে দেখল—চেঙার মতলবটা খারাপ নয়।



কাজেই বেঙা চটপট হাত-মুখ ধুয়ে, চা-পাউরুটি খেয়ে নিল। ওর সোনামামা উপহার দিয়েছিল একটা ক্যামেরা—সেটা দেরাজ থেকে বার করল। ক্যামেরাটাকে এর আগে আর কোনোদিন বেঙা কাজে লাগায়নি। তবু চেঙার কাছে ভাবখানা দেখাল এমনি যে, যেন ফটো তোলার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। চেঙাও এমন বোলচাল দিল—যেন সেও খুব ভালো ছবি তুলতে পারে। তারপর দু-জনে সাতসকালেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বেঙা ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে খুব চালের মাথায় চলল এগিয়ে। চেঙা চলল তার পাশে পাশে।



ওদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে হিজলবন।

সেই বনে গিয়ে ঢুকল ওরা। বনের ভেতরে ঢুকে বেঙার হাত নিশপিশ করে। কেবলই মনে হয়—এ জিনিসটার ছবি তুলি—ও জিনিসটার ছবি নিই। চেঙা কেবলই বাধা দেয়। বলে—"বেঙা দাদা, অমন ধড়ফড় কোরো না। আজেবাজে জিনিসের ছবি তুলে নামও হবে না, ইনামও পাবে না।"

বেঙা রেগে যায়, বলে—"থাম তুই! হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা। বেলা এক প্রহর পার, সে খেয়াল আছে?" বেঙা একটা আশশেওড়া গাছের ফটো তোলবার তোড়জোড় করছে। এমন সময় চেঙা চেঁচিয়ে ওঠে—"আরে থামো! ওই দেখো! নাদাভুঁড়ি হাতি ছুটে চলেছে।"



হাতি ছুটে চলেছে শুনেই বেঙা বেজায় খুশি! বেঙা ঘুরে দেখে সত্যিই তো তাই। চেঙা বলে—"চলো বেঙা দাদা ওদিকটাতেই এগোই। দেখি হাতিটা কোথায় যায়, কী করে? তাগবাগ বুঝে ওর যদি একটা ফটো নিতে পার, তাহলে পাঁচ হাজার টাকা মারে কে!"

চেঙার কথায় বেঙাও নেচে ওঠে। গুটিগুটি দু-জনে ক্যামেরা বাগিয়ে নিয়ে আরও খানিক এগিয়ে যায়। গিয়ে দেখে—হাতিটা শুঁড় জড়িয়ে একটা গাছ টানাটানি করছে।



চেঙা বলে—"বেঙা দাদা। আর দেরি নয়। চটপট কাজ সারো।" বেঙা বলে—"দাঁড়া, আগে ফোকাস করি।"

ফোকাস করতে গিয়ে বেঙা হয়রান। এটা ঘোরায়, ওটা ঘোরায়—ফোকাস আর হয় না। চেঙাও ঝুঁকে পড়েছিল ক্যামেরাটার ওপর। নাদাভুঁড়ি হাতিটা দূর থেকেই ওদের দেখতে পেয়েই চমকে উঠল। ভাবল—চেঙা-বেঙা অমন ঝুঁকে পড়ে তার দিকে তাক করছে কেন? তবে কি ওদের কোনো খারাপ মতলব আছে?



নাদাভুঁড়ি রেগে-মেগে হাঁক হাঁক করে ডাক ছাড়ল। চার পা তুলে তেড়ে এল চেঙা-বেঙাকে। চেঙা-বেঙা চোখ-কান বুজে ছুটল—বাপরে! মারে! চিৎকার করে। বেঙার ক্যামেরা, চেঙার জলের বোতল ছিটকে পড়ল এধারে-ওধারে! চেঙার জলের বোতলটা ছিটকে পড়ে আটকে গেল নাদাভুঁড়ির গজদাঁতে! সেটা পেয়ে নাদাভুঁড়ি ভারি খুশি। আর বেশি দাপাদাপি করল না। বোতল পেয়ে থপথপিয়ে নেচে নেচে চলল তার বাড়ির দিকে।

চেঙা-বেঙাও বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বেঙার তখনও ভয়ে কাঁপছে হাত-পা।



চেঙা বলল—"বেঙা দাদা, ভাবনা কীসের—ক্যামেরাটা তো নেয়নি নাদাভুঁড়ি! ওই দেখো—পড়ে রয়েছে।"

বেঙা বলল—"ক্যামেরাতে আর আমি হাত দেব না, ছবি তুলতে হয় তুমিই তোলো বাপু।"

চেঙাকে ছবি তোলবার হুকুম দিয়েছে বেঙা। আর তাকে পায় কে!

চেঙা দৌড়ে গিয়ে ক্যামেরাটা কুড়িয়ে নিয়ে এল। লাফিয়ে লাফিয়ে চলল আর একদিকে।



বেঙা বলল—"ওদিকে চললি কোথা?"

চেঙা বলল—"আমড়া গাছে তুতু-পুতু কাঠবেড়ালি থাকে—তার ছবি তুলব।"

বেঙা বলল—"তুতু-পুতু যেমন ছটফটে—তেমনি ভীতু—গাছ থেকে নামবেই না।"

চেঙা হেসে বলল—"সে জন্যে তুমি ভেবো না।"

আমড়াতলায় পৌঁছেই কতকগুলো পাকা পাকা বুনো কুল ছড়িয়ে দিল। কুলের লোভে তুতু-পুতু গাছ থেকে নেমে এল। ক্যামেরার কাচে তুতু-পুতুর ছবি দেখে—চেঙা ভারি খুশি।



তুতু-পুতুর গোঁফ নড়ছে, লেজ নড়ছে—ঠিক যেন সিনেমার রঙিন ছবি। চেঙা তাই দেখেই খুশিতে ডগমগ! খেয়াল নেই যে, ফটো তুলতে ক্যামেরার চাবিটা টিপতে হবে। তুতু-পুতুরও ভয় ভয় করে। তবু কুলের লোভ ছাড়তে পারে না। চেঙা পারে না ক্যামেরার কাচে সিনেমা দেখার লোভ ছাড়তে। বেঙাও একটা সিগারেট ধরিয়ে—খুব মন দিয়ে দেখছিল ব্যাপারটা। হঠাৎ খানিকটা ধোঁয়া বেঙার গলায় আটকে গেল। বেঙা খুব জোরে খক খক করে কেশে উঠল। তুতু-পুতুও সেই বিকট কাশির আওয়াজ শুনেই তড়বড়িয়ে গাছে উঠল।



তুতু-পুতু কাঠবেড়ালিটা ভয় পেল—গাছে গিয়ে উঠল বেঙার দোষেই। বেঙা তাই চুপচাপ আমড়াতলা থেকে সরে পড়ল। পাছে চেঙা বকুনি দেয় এই ভয়ে। চেঙার তখন ওসব দিকে খেয়াল নেই। সে ছুটল কাঠবেড়ালির পিছু পিছু। উঠল গিয়ে আমড়া গাছে। সরু ডালের দু-পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরল।

বেঙা চেঁচিয়ে বলল—"ভয় পেয়ো না তুতু-পুতু, তোমায় আমরা মারব না, ধরব না—শুধু একখানা ফটো তুলব।" ফটোর কথা শুনে তুতু-পুতু একেবারে কথাকলি নাচ জুড়ে দিল। চেঙা ফটো তোলার ফুরসতই পায় না।



বেঙাও দূরে দাঁড়িয়ে তুতু-পুতুর নাচ দেখছিল। হঠাৎ নজর পড়ল গাছের মগডালে—ইয়া এক থোকা পাকা আমড়া। খিদেয় তার পেট চোঁ-চোঁ করছিল। পাকা আমড়া দেখেই বেঙার নোলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তাই তাড়াতাড়ি একটা বড়ো ঢিল কুড়িয়ে নিল। ধাঁ করে ছুড়ে মারল—আমড়া পাড়বার মতলবে। ঢিল লেগে আমড়াগুলো ঝরে পড়ল চেঙার পিঠে ঢপ ঢপ করে! চেঙা বেসামাল। 'বাপরে! মারে! গেনুরে' হাঁক ছেড়ে—পড়ল আমড়াতলায়। চেঁচাতে লাগল—"দাদারে দাদা ভূতের কিল।" ভূতের নাম শুনে তুতু-পুতুও মারল এক লাফ। ক্যামেরাটা রয়ে গেল গাছের ডালে।



চেঙা গাছ থেকে পড়তেই বেঙারও পিলে চমকে উঠল। দুড়দাড়িয়ে ছুটে এল চেঙার কাছে। বলল, "ভূতের কিল নয়রে বোকা! পাকা আমড়া। ওইগুলোই পড়েছিল তোর পিঠে।"

চেঙা দেখল সত্যিই তো তাই! মিছিমিছি অতখানি ভয় পাওয়া তার ঠিক হয়নি! তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল গায়ের ধুলো ঝেড়ে। ক্যামেরাটা পেড়ে নিয়ে এল গাছ থেকে। চলল দু-জনে আমড়া খেতে খেতে।

পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে বেঙা বলল—"দেখ চেঙা, জানোয়ার-মানোয়ারগুলোর ফটো তুলে কাজ নেই—চল ওই পাহাড়ে উঠি। পাহাড়ের গুহায় সাধুরা থাকে। তাদের ফটো তুলতে ভয়ও নেই, বিপদও নেই।"



পাহাড়ে গুহা আছে, সাধুবাবা আছে—এত সব খবর চেঙা জানত না। শুধু মার কাছে শুনেছিল—পাহাড়ের বনে রকমারি ফুল আর পাখি থাকে। তাই সে বেজায় খুশি। বেঙার আগে আগেই চেঙা চলল লাফাতে লাফাতে। পাথর ঢিবি ডিঙিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। বেঙা মোটা শরীরটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলল তার পিছু পিছু। বেশ খানিকটা ওপরে উঠতেই চেঙা দেখল আঁধার-কালো গুহা। তার ভেতরে দু-দুটো আগুনের ভাঁটার মতো চোখ! দেখেই ও থমকে দাঁড়াল।

বেঙা বলল—"থামলি কেন বোকা! পা চালিয়ে চল। ওই তো সাধুবাবা জপ করতে বসেছে।"



গুহার ভেতরে বড়ো বড়ো অমন দু-দুটো চোখ দেখে চেঙার গা ছমছম করে উঠল। ভয়ে ভয়ে চাপাগলায় বেঙাকে বলল—"হ্যাঁগো বেঙা দাদা। ভূত-টুত নয়তো?"

বেঙা বলল, "দুর বোকা! ভূত বুঝি পাহাড়ের গুহায় থাকে! ভূত থাকে তাল-তেঁতুল গাছে। চল না, পা-চালিয়ে এগিয়ে চল। আমি তো রয়েছি—ভয় কীসের তোর?"

বেঙার কথায় ভরসা পেয়ে চেঙা গুহার দিকে এগিয়ে চলল। গুহার সামনে গিয়ে দেখে—চোখ ট্যারা করে কে যেন ধ্যানে বসে আছে। চেঙা তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বাগিয়ে নিয়ে আবার ফোকাস ঠিক করতে লাগল।



বেঙা চাপা গলায় বলল, "এই চেঙা! ফটো পরে তুলিস। চল, আগে সাধু মহারাজের পায়ের ধুলো নিয়ে আসি?" চেঙা কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ বেঙা দাদা, পায়ের ধুলো না নিলে সাধুবাবারা বুঝি রেগে যায়?"

বেঙা বলল, "দূর বোকা, সাধুদের রাগ-টাগ নেই। পায়ের ধুলো নিলে সাধুবাবা খুশি হয়ে পেসাদ-টেসাদ খেতে দেয়। চল গুহায় ঢুকি।"

গুহায় ঢুকতেই পেঁচু মহারাজের ধ্যান ভেঙে গেল। ডানা মেলে তেড়ে এল পেঁচু প্যাঁচা। চেঙা-বেঙা ভয়ে পেছু হটতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে।



গড়াতে গড়াতে চেঙা-বেঙা পড়ল এসে পাহাড়ের নীচে। আর একদিকে। বেঙা গড়ায়নি তত বেশি—লাফ মেরেই নীচে পড়েছে। তাই সে তাড়াতাড়ি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। চেঙা তখনও বেজায় কাবু। ঘাড়ই তুলতে পারে না তো উঠে দাঁড়াবে কী করে!

বেঙা বললে—"কীরে চেঙা, অমন করছিস কেন? এইটুকুতেই অমন ঘাবড়ালে চলে কি? ও কিছু নয়, উঠে পড়।" চেঙা চোখ বুজে চিঁ-চিঁ করে বলল—"দাদা গো দাদা, বেজায় মাথা ঘুরছে। গা ঝিমঝিম করছে—আর বুঝি বাঁচি নে।"

বেঙা বলল—"আলবাত বাঁচবি। চল—ওই তো কাছেই ফালতু বিল। দেখ, কেমন নীল জল টলটল করছে। শালুক কমল ফুটে রয়েছে কাতারে কাতারে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পাখিরা গান ধরেছে। ওখানে গিয়ে চোখ-মুখে জল দিয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিলেই গায়ের জোর ফিরে পাবি।"



চেঙাকে টেনে তুলে নিয়ে বেঙা চলল বিলের দিকে। বিলের ধারে এসে ওরা দেখল ডাঙার কাছেই একটা পোড়া কাঠ ভাসছে। বেঙা বলল—"চল রে চেঙা, ওই পোড়া কাঠের ভেলায় উঠি। দিব্যি বেড়ানো যাবে, ছবি তোলা যাবে।"

বেঙা দাদা ভেলায় চড়বার মতলব দিয়েছে, আর কি চেঙা চুপ করে থাকতে পারে! ভেলায় চড়বার শখ তার অনেক দিনের, তা ছাড়া মজা আর ডানপিটেমি পেলেই চেঙা খুশি। তাই পাহাড় থেকে গড়িয়ে অত যে তার চোট লেগেছে, সে কাথাটা একদম ভুলেই গেল। রীতিমতো তড়বড়িয়ে ছুটে গিয়ে চেঙা-বেঙা ভেলায় চড়ে বসল। ভেলাটাও ভেসে চলল বড়োসড়ো একটা ফুলের দিকে।



চেঙা বলল, "বেঙা দাদা, দেখো দেখো, খাসা ফুল। ওটারই একটা ফটো তুললে কেমন হয়?" বেঙা ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরে বলল, "সেই মতলবই তো করেছি রে বোকা। ও ফটো তোলা তোর কাজ নয়।" ফোকাস যখন ঠিকঠাক, তেমন সময় ভেলাটা হঠাৎ বুড়বুড়ি কেটে ছুটতে লাগল খুব জোরে, শোঁ-শোঁ করে। তখন দেখা গেল ভেলাটা আসলে পোড়া কাঠ নয়। রীতিমতো ইয়া এক কুমির! বেঙা ভুল বুঝতে পেরে বেসামাল। হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগল, "পুলিস! পাহারাওয়ালা! জলদি আও। বাঁচাও বাঁচাও!"

চেঙার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। বেঙার ঠ্যাংখানা জড়িয়ে ধরে বেচারা চেঙা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কুমিরটা দাঁত বার করে হো-হো করে হাসতে হাসতে ছুটল জল তোলপাড় করে।



কেলেকাঠ কুমিরটা বেঙার চেঁচানি শুনে হেসে কুটিকুটি। ওদের দু-জনকে পিঠে নিয়ে ছুটেছে সোজা পুবমুখো! দৌড়োতে দৌড়োতে বলল—"চেঁচাসনি মিছিমিছি। পুলিস পাহারাওয়ালারা হেথা কোথারে! তেনারা তো সব নালবাজারে।"

কুমিরের টিটকিরি শুনে বেঙার হুঁশ হল। বুঝল, কুমিরটার মতলব খারাপ! সত্যিই তো এখানে চেঁচিয়ে লাভ কী? অমনি সে ডান হাতে ক্যামেরাটা তুলে ধরল। মারল তিড়িং করে সাড়ে সাতগজি এক লাফ! চেঙা ছিল তার ঠ্যাং ধরে। পড়ল গিয়ে দু-জনেই জলে।



বেচারা চেঙা জলে পড়ে হাবুডুবু। তার লোমচামড়া ভিজে ঢোল। জল খায় ঢোকে ঢোকে। এর আগে কখনো সে জলে নামেনি। সাঁতারও কাটেনি কোনোদিন। ডাঙাতেই দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ায়। যাক তবুও চেঙা বেঁচে গেল, নেহাত বেঙার ঠ্যাংটা ছাড়েনি বলেই। বেঙা সাঁতারে বাহাদুর, তাই চেঙার অত ঠ্যাং-টানাটানিতেও সে জলে ডুবল না। কোনো রকমে ডাঙায় হাজির হল, কুমিরটাকে কলা দেখিয়ে।

ডাঙায় উঠে বেঙা দেখে জল খেয়ে চেঙার পেট ফুলে জয়ঢাক—ওদিকে বেলা কাবার! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে না গেলে বাড়ি ফেরাই হবে না।

বেঙা বলে—"পা চালিয়ে চল।" চেঙা নড়ে না চড়ে না। সাড়াও দেয় না বেঙার তাড়া খেয়ে। বেঙা তখন করল কী, চেঙার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। হাঁটছে তো হাঁটছেই।



যেতে যেতে চারধার আঁধার হয়ে গেল। পথ আর দেখা যায় না, চেনা যায় না। শুধু চারধারে জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি আলো। এসব দেখেশুনে চেঙার গা-ছমছম, আর বেঙার বুক ঢিপ ঢিপ করে। গহন বনের ভেতর চৌমাথায় এসে দাঁড়াল দু-জনে। চেঙা গালে হাত দিয়ে ভাবে—কোন পথ ধরবে! বেঙা ভাবে কোন দিকে যাবে—ডাইনে না বাঁয়ে? চেঙা-বেঙা কোনো রকমে এগিয়ে পেটমোটা কুটুরে গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। চেঙা বলে—"বাঁ-দিকেই বাড়ির পথ।" বেঙা বলে—"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চাস তো ডান দিকের পথ ধর।" এই নিয়ে লাগল ঝগড়া আর তর্ক। ওদিকে রাতও বেড়ে যায়। শেষটায় বেঙা রেগে-মেগে ডান দিকেই পা বাড়াল। বলল—"তোর মতলবেই এত ফ্যাসাদ। আমি চললুম এই পথে।" চেঙা বলল—"বেশ! আমি চললুম বাঁ-দিকে।"



শিশু সাহিত্য সংসদ

ISBN 978-81-7955-272-8
9 788179 552728
₹ 150.00